আমার অভিজ্ঞতায় ভাষা আন্দোলন

এম আজিজুল জলিল

১৯৪৮ সালে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে তোপখানা রোডে ইডেন ভবনের (পূর্ব পাকিস্তান সরকারি সচিবালয়) সামনে ছাত্ররা প্রথমবারের মতো অবস্থান ধর্মঘট করে। পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কার্জন হলে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার সময় ছাত্রছাত্রীদের তাৎক্ষণিক প্রতিবাদের পর এ ধর্মঘট হয়। আমি তখন ম্যাট্রিকুলেশন শ্রেণীর ছাত্র। অবস্থান ধর্মঘট পালনকালে আমার এক কাজিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রুবি ফারুককে পুলিশ ধরে নিয়ে যায়। তার অভিভাবকদের সঙ্গে আমিও তাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে দেখতে গিয়েছিলাম। এসব ঘটনা আমাকে আন্দোলিত করে। তখন থেকেই আমি ভাষা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ি।

১৯৫২ সালের জানুয়ারিতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন পল্টন ময়দানের জনসভায় ঘোষণা দেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। সেই জনসভায় আমিও উপস্থিত ছিলাম। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলন কার্যত পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ভাষা ও সংস্কৃতির মর্যাদা ও স্বীকৃতি অর্জনের লক্ষ্যে আন্দোলনও বটে। সেই আন্দোলন যখন তীব্র আকার ধারণ করে তখন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীসহ আরো অনেকের সঙ্গে আমিও বিভিন্ন সভা ও মিছিলে অংশ নিই। বিশেষ করে ২৯ জানুয়ারি এবং ৯ ও ২১ ফেব্রুয়ারির ধর্মঘট ও মিছিলে। সংস্কৃতি সংসদের পক্ষ থেকে এসব কর্মকাণ্ডে আমি সক্রিয় ছিলাম।

২০ ফেব্রুয়ারি বিকেলে সংস্কৃতি সংসদের সহকর্মী ও বন্ধু আনোয়ারুল আজিম ও আমি পরদিন ২১ ফেব্রুয়ারির বিক্ষোভ মিছিল ও অন্যান্য কর্মসূচি সম্পর্কিত সর্বদলীয় কমিটির সিদ্ধান্তের ব্যাপারে খবর নেওয়ার জন্য ঢাকা জেলা আদালত ভবনের দিকে রওনা হই। বিকেল ৫টার দিকে রথখোলা এলাকায় পৌঁছে শুনতে পেলাম ১৪৪ ধারার অধীনে পাঁচজনের বেশি লোকের সমাবেশ নিষিদ্ধ করে ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের ঘোষণার কথা। বিশ্বস্ত লোকজনের কাছ থেকে আমরা আরো জানতে পারলাম, সরকারের নির্দেশ মানা হবে কী হবে না সে ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই সর্বদলীয় কমিটির সভা ভেঙে গেছে। আমি আর আজিম তখনই সিদ্ধান্ত নিই বাংলা ভাষার দাবিতে শুধু ধর্মঘট পালনই নয়, বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নেওয়ার জন্য সব ছাত্রছাত্রীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে সংস্কৃতি সংসদের পক্ষ থেকে আমরা একটি লিফলেট ছাড়ব। আমরা কাছাকাছি কয়েকটি প্রেসে যাই কিন্তু কেউই এ ধরনের লিফলেট ছাপাতে সাহস পায় না। অবশেষে নবাবপুর রোডের একটি সরু গলির ভেতরে ছোট একটি প্রেস লিফলেটের নিচে প্রেসের নাম থাকবে না-এই শর্তে ছাপাতে রাজি হয়। আমরা সেখানেই ছোট এক টুকরো কাগজে লিফলেটের ভাষার খসড়া তৈরি করি এবং সবচেয়ে কম দামের কাগজে ৩০০ কপি লিফলেট ছাপিয়ে নিই। এ জন্য খরচ হয় ৮ টাকা, যার অর্ধেক দিই আমি এবং বাকি অর্ধেক আজিম। ঠিক হয় পরদিন সকালে আমি এগুলো কলাভবনে এবং আজিম সে রাতেই এস এম হল আর মেডিকেল কলেজে বিলি করবে।

২১ ফেব্রুয়ারি সকালে আমি পল্টন ও তোপখানা রোডের মোড়ে এসে আবুল বরকতের সঙ্গে দেখা করি। বরকত পল্টন লাইনে তার মামার সঙ্গে থাকতেন, যিনি সরকারের একটি বিভাগে হিসাব কর্মকর্তা ছিলেন। ক্লাসে বরকত আমার সিনিয়র ছিলেন। আমার সঙ্গে তার বেশ বন্ধুত্ব ছিল। সেগুনবাগিচার যে জায়গাটায় দুটি বড় পুকুর ছিল সেখানে প্রায় সন্ধ্যায় আমরা একসঙ্গে অনেক সময় কাটিয়েছি। সেদিন সকালে রাস্তায় কোনো বাস না চলায় আমরা হেঁটে এক সঙ্গে কলাভবনের দিকে রওনা দিলাম এবং ৯টা নাগাদ সেখানে পৌঁছলাম। সেখানে সংস্কৃতি সংসদের লিফলেটগুলো বিলি করলাম। শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাই নয়, বিভিন্ন স্কুল-কলেজ থেকেও বহু ছাত্রছাত্রী এসে জড়ো হয়েছে। গাজীউল হকের সভাপতিত্বে আমতলায় সভা শুরু হলো। কয়েকজনের বক্তৃতার পর সংস্কৃতি সংসদের পক্ষ থেকে আমি বক্তৃতা দিলাম। আমি মিছিলের ওপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের পক্ষে মত দিলাম। আমার বক্তৃতা শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ পর সমাবেশ এলাকায় শান্ত ও সতর্ক প্রকৃতির বরকত আমার কাছে এসে উদ্বেগের সঙ্গে জানতে চাইলেন, আমাদের পরবর্তী কর্মসূচি কী। বেলা ১টার দিকে সভা শেষ হলো এবং সিদ্ধান্ত হলো আমরা ১০ জন ১০ জন করে রাস্তায় এসে শান্তিপূর্ণভাবে ১৪৪ ধারা লঙ্ঘন করব। আমরা পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদ ভবনের সামনে যাওয়ার পরিকল্পনা করি, যেখানে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য একটি প্রস্তাব পাস করার দাবিতে পরিষদের সদস্যদের দিনের শেষে মিলিত হওয়ার কথা।

মিছিল নিয়ে মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় খুব দ্রুতগতিতে একটি পুলিশের ভ্যান এসে আমাদের সামনে দাঁড়াল। পাঁচজন পুলিশ গাড়ি থেকে নেমে আমাদের ওপর এলোপাতাড়ি লাঠি চালাতে থাকল। আমার পিঠেও একটি লাঠির বাড়ি পড়ল এবং আমি, বদরুল আমিন ও রেজাউল করিম আরো আঘাত এবং সম্ভাব্য গ্রেপ্তার

এড়াতে দ্রুত কাঁটাতারের বেড়া পেরিয়ে হোস্টেলের ভেতর ঢুকে পড়লাম। হোস্টেলের ছাত্ররা আমাকে চোখ-মুখ ধোয়ার জন্য পানি দিল। এরপর আমি সংলগ্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গেলাম। কিছুক্ষণ পর বদরুল বকশিবাজারে তার বাসায় চলে গেল। রেজাউল গেল এস এম হলে। বেলা দেড়টার দিকে আমি আবার আজিমের সঙ্গে দেখা করলাম এবং পরবর্তী ১ ঘণ্টা মেডিকেল কলেজেই কাটালাম। পৌনে ৩টার দিকে আমরা হোস্টেলে ফিরে এলাম। হোস্টেল গেটের ঠিক ভেতরেই অনেক ছাত্র জড়ো হয়েছে। তাদের মধ্যে বরকতও রয়েছেন। তারা রাস্তার অপর পাশে দাঁড়ানো পুলিশের দিকে লক্ষ করে ইটের টুকরো ছোঁড়া শুরু করলেন। এতে কয়েকজন পুলিশ সামান্য আহত হয় এবং বেলা ৩টার দিকে কোনোরকম সতর্ক করে দেওয়া ছাড়াই তারা ভারপ্রাপ্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এস এইচ কোরেশি এবং হোসেন হায়দারের নির্দেশে গুলিবর্ষণ শুরু করে। সে সময় আমি পেছনের হোস্টেল ঘরের বারান্দায় এসে রাইফেলের গুলি এবং হৈচৈয়ের শব্দ শুনতে পাই।

কিছুক্ষণ পর আমি মেডিকেল কলেজের জরুরি বিভাগের সামনে গিয়ে দেখতে পাই দুজন ছাত্র বরকতকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তার দেহ থেকে বিপুলভাবে রক্তপাত হচ্ছিল, তবে তখনো তার জ্ঞান ছিল। তিনি আমাকে বললেন, তিনি গুলিবিদ্ধ হয়েছেন এবং শীত লাগছে। তাকে অপারেশন ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। কী হয় জানার জন্য কয়েকজন ছাত্রের সঙ্গে আমিও বাইরে অপেক্ষায় রইলাম। আধা ঘণ্টা পর ডা. শামসুল আলম অপারেশন কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে উদ্বেগভরা কণ্ঠে আমাদের জানালেন, তিনি সম্ভব সব কিছুই করেছেন, কিন্তু বরকতের বাঁচার সম্ভাবনা নেই। তার পায়ের ধমনীতে ৩০৩ রাইফেলের একটি বড় আকৃতির গুলিবিদ্ধ হয়েছে এবং রক্তপাত বন্ধ হচ্ছে না। তিনি আমাকে বললেন, 'বাবা, বাঘ মারা গুলি দিয়ে মেরেছে, কী করব'। সে সময় শুনতে পেলাম আরো এক ব্যক্তি গুলিবিদ্ধ হয়েছেন এবং ইতিমধ্যেই মারা গেছেন। আমি হাসপাতালের মর্গে গিয়ে বারান্দায় তার মৃতদেহ দেখতে পেলাম। অজ্ঞাত লোকটির পরনে ছিল সাদা পাজামা ও শার্ট এবং কালো জুতা। তার মাথায় গুলি লেগেছিল।

একই দিন সন্ধ্যা ৭টার দিকে আনোয়ার হোসেন নামে একজন বামপন্থি ছাত্রকর্মী সাইকেলে আমাদের বাসায় এল। সে জানাল, বরকত তাকে একটি সোয়েটার নেওয়ার জন্য পাঠিয়েছেন। কারণ ক্রমাগত রক্তপাতের কারণে তিনি শীতে কাঁপছেন। বরকতের বাসা আমাদের বাসার কাছেই। আমি তখনই তার সোয়েটার নিয়ে এলাম। আনোয়ার তা হাসপাতালে নিয়ে গেল। এর ১ ঘণ্টা পর সে আমার কাছে খবর পাঠাল যে, বরকত মারা গেছেন এবং তাকে কবর দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত।

পরদিন ২২ ফেব্রুয়ারি আমি বাসায় নিশ্চল সময় কাটালাম। আগের দিনের শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তিতে একটি নিদ্রাহীন রাত কাটিয়েছি। বন্ধু ও ছাত্র মৃত্যুর বেদনায় মন ভারাক্রান্ত। পুলিশ বাড়িতে এসে আমাকে ধরে নিয়ে যেতে পারে মনে এই আশঙ্কাও কাজ করছিল। তবে বিকেলে বন্ধুদের কাছ থেকে জানতে পারলাম, আগের দিন যারা শহীদ হয়েছেন তাদের রক্তমাখা পোশাক নিয়ে ছাত্ররা একটি বিরাট মিছিল নিয়ে বের হলে ঢাকা হাইকোর্টের কাছে পুলিশ আবারও মিছিলে গুলি চালিয়েছে। পুরান ঢাকার সাধারণ মানুষ প্রথমবারের মতো ওই মিছিলে অংশ নিয়েছে ছাত্রদের সঙ্গে তাদের সংহতি ও সহানুভূতি প্রকাশ করতে। এটা ছিল একটি বাঁক ফেরানো ঘটনা এবং তা কেবল এ কারণেই নয় যে, এর ফলে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার দাবির পক্ষে শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে, বরং পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকারের জন্য ছাত্রছাত্রীরা যে দাবি তুলেছিল তার সঙ্গে সাধারণ মানুষের সংশ্লিষ্টতাও এর মাধ্যমে শুরু হয়েছিল।

স্মৃতি থেকে লেখা

ইংরেজি থেকে অনূদিত (সংক্ষেপিত)

এম আজিজুল জলিল : বায়ান্নর ছাত্রকর্মী। সাবেক বিশ্বব্যাংক কর্মকর্তা। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী।